বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলন

শুচিস্মিতা সেনচৌধুরী

— একটি অতিকথন ও তার নির্মাণ প্রণালী

“বাংলা আজ যা ভাবছে — ভারতবর্ষ ভাববে আগামীকাল।” গোপালকৃষ্ণ গোখলের কোনও রচনায় এমন কোনও কথার উল্লেখ না পাওয়া গেলেও বাংলার স্কুলের রচনা থেকে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায় সর্বত্রই শোনা যায়, — “মহামতি গোখলে বলিয়াছেন.....”।

একটা সময় অর্থে — বলা যায় কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ার পর থেকেই এই শহরকেন্দ্রিক এলিট মানুষজন সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গোটা ভারতকে প্রভাবিত করতে শু করে। কিন্তু সেই গোখলেও নেই, সেই বাংলাও নেই আর। ৪০-এর দশক জুড়ে বাংলা দেখছে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝর, দুর্ভিক্ষ মহামারী দাঙ্গা আর দেশ বিভাগও। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের পর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে সরকারি ক্ষমতা ভোগ করছে কমিউনিস্টদের বকলমে শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্তরা।

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতো করে নারীশিক্ষা, নারীস্বাস্থ্য, নারীদের গড় আয়কে মানক ধরলে দেখা যাবে আমরা ভারতের বাকি অনেক রাজ্য থেকেই পিছিয়ে। ’৪৭ পূর্ববর্তী বাঙালী কি এমন স্বপ্ন দেখেছিল? তখনকার যে বর্তমান থেকে তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছিল, সেই বর্তমানকেই বা কোন চোখে দেখছিল তারা? আমরাই বা কিভাবে বিশ্লেষণ করব সে সময়? কার সাহায্য নেব? আমাদের এই সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের জন্য বেছে নিলাম পরিচিত তিনজন ব্যক্তিকে। এরা প্রত্যেকেই বাঙালী, হিন্দু, উচচবর্ণ এবং তা সত্ত্বেও কেউকেটা নন কোনও অর্থেই। এদের মধ্যে দুজনের বয়স নববইয়ের ঘরে আর একজন সাতাত্তর। কাজেই প্রত্যেকেই বাঙালী জীবনের সবকটি গুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য এদের নাম, বর্তমান ঠিকানা, পিতা, মাতা, বা স্বামীর নাম উল্লেখ করে নেব। এরপর আসবে এদের বক্তব্য অনুযায়ী তৎকালীন সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এর মধ্যে দিয়েই বোঝার চেষ্টা করব এদের দায়বদ্ধ, সংস্কার এবং ধারণা। গল্পের মতই চলে আসবে কিছু গুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পরিচয় ঃ

ক। সুশীল কুমার চক্রবর্তী ঃ নাম জানতে চাওয়ায় ইনি বললেন — “টাইটেল একটু অসুবিধা হবে। আমার টাইটেল চক্রবর্তী আর আমি যখন অ্যারেস্ট হয়েছিলাম তখন টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম যাতে বাড়িতে গিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেস না করতে পারে। তখন টাইটেল ছিল সুশীল কুমার রায় চক্রবর্তী।”

বাবা ঃ প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী, মা ঃ প্রিয়বালা চক্রবর্তী, বয়স ঃ ৯৮, জন্মসাল ঃ ১৯০২, জন্মস্থান ঃ জেলা ঃ ফরিদপুর, সাব ডিভিশন ঃ মাদারীপুর, থানা ঃ পালং, গ্রাম ঃ ধানুকা, বর্তনাম ঠিকানা ঃ কলোনীবাজার, বেলঘরিয়া।

খ। পুষ্পলতা চক্রবর্তী ঃ বাবা ঃ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মা ঃ নীরদবালা চক্রবর্তী, স্বামীর নাম ঃ প্রাণহরি চক্রবর্তী, বয়স ঃ ৯০, জন্মস্থান ঃ জেলা ঃ চট্টগ্রাম, থানা ঃ ফটিয়া, গ্রাম ঃ দক্ষিণবুম্নি, বর্তমান ঠিকানা ঃ শান্তিনগর, খড়দহ।

গ। অমলা ঘোষ ঃ বাবা ঃ কামিনীকুমার দত্ত, মা ঃ কিরণবালা দত্ত, স্বামীর নাম ঃ প্রবোধ কুমার ঘোষ, বয়স ঃ ৭৭, জন্মসাল ঃ ১৯২৩, জন্মস্থান ঃ জেলা ঃ ফরিদপুর, সাব ডিভিশন ঃ মাদারীপুর, গ্রাম ঃ আলগি, বর্তমান ঠিকানা ঃ পশ্চিম পানশিলা, খড়দহ

উল্লেখিত তিনজনের প্রত্যেকেরই জন্ম তখনকার পূর্ববঙ্গে। শৈশব বা কৈশোর কেটেছে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশকে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে যে সময় কৃষিকর্মরত ভূমি মালিক ও প্রজারা দ্রুত জমি হারাচ্ছেন। (৩৩ শত াংশ হারে,) বাড়ছে জমিদার ও খাজনা ভোগীদের বিত্তশেরেনা চাকরির দ্রুত জন্য ভীড় বাড়াচ্ছেন উচচশিক্ষায় ও শহরে। যে কোনো সময় বা সমাজের মতোই মধ্যবিত্তেরহতাশা ও ত্রোধ রূপ পাচ্ছে একেবারে গণভিত্তিহীন তথাকথিত বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। তাদের মনোজগতে তখন শুধুমাত্র একদল বি. এ. বা এম. এ. পাশ করা হিন্দু মধ্য বা উচচ মধ্যবিত্ত আর একটি চাকরি, একটি চাকরি এবং যে কোনো মূল্যে একটি চাকরিই শুধুমাত্র।

শৈশব ও শিক্ষা ঃ

সুশীল চত্রবর্তী তখনকার ফার্স্ট ক্লাস পাশ, অর্থাৎ এখনকার ক্লাস টেন বা মাধ্যমিক। স্কুলের নাম-তুলসার হাইস্কুল। বেশিদূর লেখাপড়া না করতে পারার কারণ হিসেবে তিনি জানান — অনেক অল্প বয়সেই তাকে স্বজনহারা হতে হয়। দেড় বছর বয়সে বাবা মারা যান। কাকা ছিলেন অভিভাবক। কিন্তু তিনিও অল্প বয়সেই মারা যান। আর সবচেয়ে উল্লেখযে াগ্য ঘটনা হল, মা ছাড়া বাকি সকলেই মারা যান কলেরায়।

সেসময় মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকলেও পারিবারিক বাধা ছিল বড় রকমের। সংস্কার বা নিয়ম বলে চালিয়ে দেওয়া একটা ধধারণা মাত্র। যে কারণে দেখা যায় উচচ মধ্যবিত্ত ত্রেণীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দুজন মহিলার একজনও ম াধ্যমিক বা তখনকার ফার্স্ট ক্লাস, এখনকার দশ ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন না। এদের মধ্যে অমলা ঘোষ ক্লাস এইট পাশ এবং পুষ্পলতা চত্রবর্তী ফোর। প্রথম জনের স্কুলের নাম জানা যায়নি তবে দ্বিতীয় জন যে স্কুলে পড়তেন তার নাম — ফটিয় া প্রাইমারী স্কুল।

উভয়েরই শৈশব কাটে স্বচছন্দে। কারণ, এদের জমিজমা ছিল প্রচুর। যদিও এরা জমিদার নয় কেউই, উচচ মধ্যবিত্ত। এঁদের কথা অনুসারে মুসলিম মেয়েরা সেসময় স্কুলে আসত না। মুসলিম ছেলেরা যে খুব লেখাপড়া করত তাও নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হলেও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বেশির ভাগ মহিলার শিক্ষ ার ক্ষেত্রে কোনও স্বাধীনতা ছিল না। উল্লেখ্য, এই তিনজনের কারও কোনও মুসলিম বন্ধু ছিল না। এমনকি পাড়াতেও নয়।

দেশের বাড়ি ঃ

দেশের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে সুশীল চত্রবর্তী বললেন, তারা জমিদার ছিলেন না। তবে জায়গা-জমির অভাব ছিল না কোনও, বাগানছিল বাড়িতে। সেখানে অন্যান্য গাছের সঙ্গে ছিল মান্দার গাছ। জ্বালানি হিসেবে এরই কান্ডব্যবহার হত তখন। কয়লা ছিল না। আর বাকি জমিতে যা ফসল হত তাতে সবারই প্রাথমিক চাহিদাগুলো মিটে যেত। কাজেই কারও জীবিকার প্রয়োজন ছিল না। কাকা অর্থাৎ তার শেষ অভিভাবকের মৃত্যুর পর তাকে দেশ ছাড়তে হয়। কথা বলতে বলতেই ১৯১৯ সালের এক ভয়াবহ বন্যার কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। তখন তার বয়স সতেরো। ওঁর দেখা সবচেয়ে ভয় াবহ বন্যা সেটাই।

বাকি দুজনেরও দেশের বাড়ির অবস্থা প্রায় এক। অনেক জমিজমা, ঘর-বাড়ি, প্রজা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও, এরা কেউই জমিদার ছিলেন না। অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী। যুত্ত বাংলার কোথাও কোনও জমিদার ও খাতক প্রজার মধ্যবর্তী এমন মধ্যস্বভে াগীর সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়েছিল। পুষ্পলতা চত্রবর্তীর কথায় তাদের জমি ছিল ষোল বিঘা ও ছত্রিশ কাঠা। এর মধ্যে কিছুট া নিজেদের, কিছুটা ভাগের। অমলা ঘোষ যদিও তাদের পৈতৃক জায়গা-জমির হিসাব দিতে পারেন না। তবে উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিষয়ে খুব মিল দেখা যায় — এদের জায়গা-জমি চাষের দায়িত্বে ছিল অধিকাংশই মুসলমান প্রজা।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন বাংলার কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির কৃষি শ্রমিকদের বেশীরভাগই ছিল মুসলমান। এই শ্র মিক শ্রেণীর অন্তর্ভুত্ত ছিল কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসী। এখন প্রা হল, উপরিউত্ত উচচবিত্ত বাঙালীরা যখন এদের "প্রজা" বলে সম্বোধন করেন তখন এরা কি নিছকই একটা সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায়? ঔপনিবেশিক ভারতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম থেকেই একটা বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে এর প্রভাব পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর।

পূর্ব থেকে পশ্চিম ঃ

সুশীল চত্রবর্তী ফরিদপুর থেকে কলকাতায় আসেন ১৯৩০ সালে। দেশ ছাড়ার পেছনে ছিল দুটি কারণ — ১) কাকার মৃত্যুর পর তিনি একদম একা হয়ে পড়েন। ফলে তার পক্ষে একা সমস্ত দেখাশোনা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়; ২) তিনি

তখন যে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত, তারই নির্দেশে কলকাতায় আসতে হয়।
কলকাতায় এসে তিনি ওঠেন উল্টোডাঙ্গার গোয়ালপাড়ায়। এখানে এক ভাড়া বাড়িতে থাকতে শু করেন। তখন সঙ্গে কে ানও মহিলা না থাকলে ঘর ভাড়া পাওয়া যেত না। বৈপ্লবিক কাজকর্ম সেসময় এত জোরদার চলছে যে পুষমাত্রই বিপ্লবী বলে সন্দেহ করা হত। এ কারণে, দলের দুজন মহিলা (হাস্যবালা চক্রবর্তী ও মায়া নাগ)-র সাহায্যে গোয়ালপাড়ার বা ড়িটি ভাড়া করা হয়। এদের পরিচয় দিতে হয়েছিল নিজের আত্মীয় হিসাবে। কলকাতায় তিনি তার একজন ছাত্রের সহযে াগীতায় চাকরি পান বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে। ১৯৫৩ সালে শেষবার গেছেন তখনকার পূর্ব পাকিস্থানে।
পুষ্পলতা চক্রবর্তী কিন্তু কলকাতায় আসেন অনেক পরে — ১৯৫৫ সালে। আর সেই শেষ দেখা জন্মভূমিকে। দেশভ াগের সময় চট্টগ্রামের পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধাজনক না থাকায় তাকে দেশ ছাড়তে হয়। তার স্বামী অবশ্য তখন এখ ানেই। কম্পাউন্ডারি পাশ করে চাকরি করছেন। এখানে এসে তিনি সুরেশ ব্যানার্জী রোডের এক বাড়ীতে ওঠেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আন্দুলে বাড়ি ভাড়া করেন এবং আরও পড়ে খড়দায় চলে আসেন। স্বামী ভারতীয় বলে পরিচিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের বাড়ি এবং জায়গা-জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া বাড়ির দলিল-পত্র একবার বন্যায় নষ্ট হয়ে য াওয়ায় কিছুই আর পুনদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
অমলা ঘোষ যদিও এখানে আসার সময়টাকে ঠিকঠাক মনে করে বলতে পারেন না, তবে ওঁর কথায় বিয়ের পর পরই। অর্থাৎ ১৯৪০-এর কিছু আগে বা পরে। তারপর যাতায়াত ছিল অনেকদিন। ১৯৫৭ সালে তিনি শেষবার যান। স্বামী কলকাতায় চাকরি করতেন। এখানে প্রথম এসে উঠতে হয় দেওরের কাছে। হস্টেলের একটি ছোট্ট ঘরে। এরপর পটলডাঙ ায় বাড়ি ভাড়া করেথাকেন অনেকদিন। খড়দায় আসেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পরও এঁরা যাতায়াত করেছেন পূর্ববঙ্গে। এবং প্রত্যেকে পঞ্চাশের দশকে শেষবার গেছেন। অর্থাৎ এরপরই যেন স্থায়ীভাবে ভেঙে যায় দুই বাংলা।
পরিবার পরিচিতি ঃ
অনুসন্ধানের তিনজনেরই পরিবার-পরিজন সম্পর্কে অল্পবিস্তর তথ্য এতক্ষণ দিয়ে এসেছি। কিন্তু প্র-উত্তরের বাইরেও কথা হয় এবং বারবারই ঘুরেফিরে আসে পরিবার, যা বাদ দেওয়া যায় না কোনও ভাবেই। কারণ, এদের পরিবারের মধ্য দিয়েই হয়ত ধরা দেবে তৎকালীন সমাজ। যেমন মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহ একটি গুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পুষের ক্ষেত্রে জীবিক া। এবং এই দুটি বিষয় নির্ভর করে পারিবারিক সংস্কারের ওপর। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য বহন করে বিবাহরীতি বা প্রথা। জীবিকার ক্ষেত্রে ঘটনা একটু অন্যরকম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাত-পাত প্রথার একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে অর্থনীতি এবং তা নির্ধারিত হয় জীবিকার মাধ্যমে। বিশেষ করে জীবিকা যদি বংশপর ম্পরা অনুযায়ী চলে। এখন দেখা যাক্, এদের ক্ষেত্রে বিষয়-দুটি কতটা তথ্য-সমৃদ্ধ।
সুশীল চক্রবর্তী-র পরিবার বলতে তেমন কেউ ছিল না। বাবা ও মা যেহেতু অল্প বয়সে মারা যান সেহেতু তার ওপর পা রিবারিক সংস্কার সেরকমভাবে প্রভাব বিস্তার করার কথা নয়। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ এলে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর বংশ এবং কাস্ট র‍্যাঙ্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার বিয়ে হয়েছিল এক বিপ্লবী বন্ধুর বোনের সঙ্গে এবং তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। যদিও তার বিয়ের সময় অভিভাবক বলতে কেউ নেই। বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রী-র বয়স ছিল সতেরো আর নিজের তিরিশের ওপর। বয়সে এই বিরাট ব্যবধান কিন্তু উনি স্বীকার করেন অকপটে।
দ্বিতীয়জন অর্থাৎ পুষ্পলতা চক্রবর্তীর বিয়ে হয় সাড়ে দশ বছর বয়সে। বরের বয়স তখন চব্বিশ।শ্বশুরবাড়ি ছিল চট্টগ্র ামের পূর্বনালুয়াগ্রামে।শ্বশুরশাশুড়ীর প্রথমে কোনও সন্তান না থাকায় তারা একটি মেয়েকে দত্তক নেন। পরবর্তী সন্তান বা প্রথম সন্তান এই ছেলে। এক্ষেত্রেও বিয়ে হয় দুই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে। এই মহিলার বাবার দুই বিয়ে। ইনি মায়ের প্রথম সন্তান।
শ্রীমতী অমলা ঘোষের বিয়ে হয় ১৭ বছর বয়সে। বরের বয়স তখন তিরিশ। তিনি বিপ্লবী ছিলেন। অনেক অল্প বয়সেই ত াকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারাতে হয়েছিল বলে অনেক কষ্টেই বড় হতে হয়। বিয়ের পর অমলা দেবী বেশীরভাগই বাপের বাড়ীতে থাকতেন বলেশ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নেই।
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েদের বিয়ের বয়স বেশ কম এবং ছেলেদের তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। আসলে তখন

অল্প বয়সেইমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত, কারণ তাদের করার কিছু ছিল না। এখনকার মতো মেয়েদের লেখাপড়া বা চাকুরির সুযোগ কোথায় তখন?বাঙালির বহু প্রচারিত সংস্কৃতি বা কালচার তখন কিন্তু তুঙ্গে। শহুরে উচচ বা উচচ মধ্যবিত্তের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়ছে যথেষ্টই। আর এদের কোনও প্রয়োজনেই যেন নতুনকে গ্রহণ করার চেয়ে পুরনো ধ্যান-ধারণা বজায় রাখার চেষ্টাটাও রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। হয়ত তাই আমরা সমাজকে এভাবে দেখতে পাই। যেমন, অন্তবিবাহ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বা উচচবর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সম-পর্যায়ভুক্ত হিন্দুদের বিয়ে। এখানে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বাংলা ঃ

সাধারণভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মূলত কংগ্রেসী আন্দোলন হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকাই বেশী গুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খুব একটা কংগ্রেসী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল না। এছাড়া কৃষক অভ্যুত্থান, শ্রমিক আন্দোলন, আদিবাসী বিদ্রোহ ইত্যাদি বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হয় না। যদিও প্রশ্ন থেকেই যায় যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কতটা স্বাধীনতার জন্য হয়েছিল এবং কতটা সফল হয়েছিল। প্রশ্ন জাগে সেইসব দলের উদ্দেশ্য নিয়ে, যারা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের রূপকার বলে পরিচিত। কারণ, কংগ্রেস যদি হিন্দু জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের দল হয়ে থাকে তবে কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্যই তখনকার মধ্যস্বভোগী হিন্দু বাঙালীদের। প্রতিটি দলই কোনও-না-কোনও ভাবে শহর কেন্দ্রিক উচচবর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধি — যে কারণে মুসলমান বা নিম্নবর্ণ হিন্দুরা তাদের কাছে শুধুই সংখ্যা মাত্র। যে আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তার সার্থকতা কতটুকু?

এবার আমরা ফিরে আসি সেই তিনজনের কথায়। তারা কিভাবে দেখেছেন সে সময়ের রাজনৈতিক বাংলাকে।

সুশীল চত্রবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি পূর্ববঙ্গের একটি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। অর্থাৎ ১৯২২ সালে। দলের নাম — 'অনুশীলন সমিতি'। সমসাময়িক আর একটি দল (যুগান্তর)-ও তখন চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনকে পরিচালনা করছে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, একই জায়গায় দুটি তথাকথিত বিপ্লবী দল থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুশীলন সমিতিকেই কেন বেছে নিলেন। এর উত্তরে তিনি জানালেন — ক) অনুশীলন সমিতির কার্য-পদ্ধতি ছিল সুপরিকল্পিত; খ) এদের সদস্যদের সংখ্যাও ছিল বেশী এবং গ) যুগান্তরের থেকে এই দলের কর্মক্ষমতাও কিছু বেশী। তার কথায় দলে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সমিতির নেতারা স্কুলে স্কুলে গিয়ে তাদের ভাবধারা প্রচার করতেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগাতেন। এছাড়া অনুশীলন সমিতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য — দলের ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুষ্ঠি-ভিক্ষা করতেন এবং তা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। হয়ত সামাজিক ভাবে হিন্দু উচচ ও উচচ-মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্নশ্রেণীর মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্যই তারা এই পথ গ্রহণ করেন।

অনুশীলন ও যুগান্তর দল সম্পর্কিত কিছু বহুল প্রচারিত তথ্য দেওয়া হল।

অনুশীলন সমিতি ঃ—

ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ১৯০২ সালে বাংলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৯ সালের জুন মাসে পুলিশের গুপ্তচর বলে পরিচিত জনৈক গনেশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চড়াও হন ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। কিন্তু তারা ভুল করে হত্যা করেন গনেশের ভাইকে।

১৯১১-র ২১শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা পুলিশের সি আই ডি বিভাগের হেড-কনস্টেবল শ্রী শচীন্দ্র চত্রবর্তী এই সমিতির একজন সত্রিয় কর্মীর হাতে খুন হন।

ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা অফিসার মনমোহন দে, ময়মনসিংহ জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর রাজকুমার, বরিশাল জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মনমোহন ঘোষ আর তার সঙ্গে পুলিশের সাহায্যকারী যোগারঙ গ্রামের রাহুল দেওয়ান ও তার ভাই অনুশীলন সদস্যদের হাতে প্রাণ হারান।

যুগান্তর দল ঃ—

বিপ্লবীদের সাপ্তাহিক মুখপাত্র 'যুগান্তর' প্রকাশনা শু হয় এপ্রিল, ১৯০৬ সাল থেকে। বরিশালে সাম্রাজ্যবাদী দমনপীড়নের

পর ২২শে এপ্রিল সম্পাদকীয়তে খোলাখুলিই লেখা হল "দেশের ৩০ কোটি মানুষ যদি তাদের ৬০ কোটি হাত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে, তবেই বন্ধ হবে এ অত্যাচার। একমাত্র শক্তি দিয়েই শক্তির প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব।"

১৯০৭ সালে সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সম্পাদক হিসেবে ১ বছর জেল খাটেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল যুগান্তর দলের দুই কর্মী প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদীরাম বোস কিংসফোর্ডের গাড়ী ভেবে একটি গাড়ীতে বোমা ছোঁড়েন। এই ঘটনায় দুই ইংরেজ মহিলা প্রাণ হারান।

১৯২৩ সালে যুগান্তর সমিতি ডাকাতির মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে।

বিশেষ ঃ ১৯৪৪-এর মধ্যে প্রধান বৈপ্লবিক দলগুলি যেমন, 'অনুশীলন সমিতি'র বিভিন্ন শাখা, 'যুগান্তর দল'-এর সংগঠনগুলি এবং পূর্ণদাসের নেতৃত্বাধীন 'মাদারীপুর সমিতি' বাঘা যতীনের নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয়। তবে এদের বহু পরিকল্পনা স্বাভাবিক কারণেই ব্যর্থ হয়।

এই সমস্ত বিপ্লবী দলের সকলেই ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালী। সুশীল চক্রবর্তীর কথায় জমিদাররা কোনও আন্দোলনে যোগদান করত না বরং তারা বাধা দিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সাহায্য করত।

অন্যদিকে, মুসলমানদেরও বিপ্লবী আন্দোলনে কোনও ভূমিকা ছিল না। তারা বলত — "হিন্দু রাজত্ব"। মুসলমানদেরও শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ ছিল না এবং বেশীরভাগই ছিল কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ এরা তখন দ্রুত বর্ধমান কৃষি-শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

কিছু তথ্য ঃ— ১৯২০ সালে প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় মুসলমান 'হিজরৎ' করে (অর্থাৎ ইসলাম শাস্ত্র অনুযায়ী শত্রু কবলিত রাজ্য পুনদ্ধার কল্পে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় অন্যত্র আত্মনির্বাসন) আফগানিস্থান চলে যান। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ সীমান্তে গ্রেপ্তার হন এবং তাদের সকলকে পেশোয়ারে পর পর চারটি বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডেদন্ডিত করা হয়। ঐ মুহজিরীণ বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মজীদ, শওকত উসমানি, রফিক আহমেদ, প্রমুখ।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী কার্য-কলাপ এবং সূর্য সেন ঃ

১। ১৯২২ সালে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের চট্টগ্রাম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন অনেক বিপ্লবী। এই সুযোগে সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে অনুশীলন আর যুগান্তর দলের নেতৃত্বে কাজকর্ম শু করার সিদ্ধান্ত নেন।

সেই সময়কার চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মূল কর্মসূচী ছিল "প্রোগ্রাম অফ ডেথ"। যদিও কেবলমাত্র মৃত্যুবরণ করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া এবং পেছনে না ফেরা।

২। ১৯২৩ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে রেল ডাকাতি হয়।

৩। ১৯২৪ সালে সূর্য সেন টেগার্ট হত্যার চেষ্টা করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

৪। ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ১৮ই এপ্রিল মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের আবেদন জানিয়ে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি একটি ইশতেহার বিলি করে।

এদিন রাত দশটায় একদল বিদ্রোহী শহরে দুটি অস্ত্রাগার দখল করে এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়।

৫। ১৯৩৩ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের গৈরলা গ্রামে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এই বিপ্লবী।

৬। ছয় মাস মামলা চলার পর ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৩ রায় বের হয়।

৭। ১৯৩৪-এর ১৩ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলেই তার ফাঁসি হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পর প্রায় ছয়-সাত মাস এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সূর্য সেন। তবে কিভাবে যেন খবর পেয়ে যায় পুলিশ। একদিন প্রায় আশি জনের এক পুলিশবাহিনী তার বাড়িতে হানা দেয়। এই মহিলার বাবা এবং জ্যাঠার অস্বীকার করেন। ব্রিটিশের সৈন্যরা নানান রকমভাবে এদের প্ররোচিত করতে থাকে। টাকা-পয়সা, দই-মিষ্টি দিয়ে সূর্য সেনের হদিস দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। সূর্য সেন সে সময় একটি গেয়া রঙের শাড়ি পড়ে ঘোমটা টেনে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান। যেন কোনও মহিলা ঘাটে যাচ্ছে জল ভরতে। তাকে ঘিরে আর জিজ্ঞাসাবাদ করেনি কেউ। এরপর অবশ্য সূর্য সেনকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। কারণ এই ঠিকানা তখন পুলিশ জেনে গেছে।

নেত্র সেন (সূর্য সেনের মামাতো ভাই) সাত হাজার টাকার (যদিও সূর্য সেনকে খুঁজে দেওয়ার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ১০ হাজার টাকা) বিনিময়ে পুলিশকে সূর্য সেনের গোপন আস্তানার খবর দেন। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঝিাসঘাতকতার জন্য মাষ্টারদার শিষ্যরা তাঁকে হত্যা করেন।

উল্লেখ্যযাগ্য — ৩

তৃতীয়জন সেরকম কোনও ঘটনার সাক্ষ্য বহন করেন না। তবে অমলা ঘোষের স্বামী প্রবোধকুমার ঘোষ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ছ'মাসের জন্য তাঁর জেল হয়েছিল। দোকানে দোকানে পিকেটিং করার সময়ই পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাঁকে। তবে গুতর দোষ না থাকায় তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যান। ইনি ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন।

প্রত্যেকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটে তিরিশের দশকে। এসময় বহু বিপ্লবী কার্যকলাপ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ সালে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল — এই বিশাল ভারতবর্ষের এক কোণে অতিসাময়িক ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটলেও বাস্তবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে যথার্থভাবে কতটুকু দুর্বল করা যাবে এবং তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্ভাবনা কতটুকু এগিয়ে যাবে? ১৯৩৪ নাগাদ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ সেই পর্যায়ে পৌঁছায়। বলা যায়, প্রকৃত গণভিত্তির ভয়ানক পুলিশী অত্যাচারের মুখে বিপ্লবী দলগুলি ভেঙে যায়।যে সব জায়গায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম চলত সেই সব এলাকায় জনগণের উপর জরিমানা ধার্য করা হয়। সংবাদ মাধ্যম পড়ে সেন্সরের কবলে।

সে-সময় পত্র পত্রিকা ঃ

প্রসঙ্গত সে সময়ের কয়েকটি বাংলা পত্র পত্রিকার নাম দেওয়া হল —

(১) আত্মশক্তি, (২) সারথি, (৩) বিজলী, (৪) লাল বাংলা, (৫) যুগান্তর — সম্পাদক ঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, (৬) মন্দিরা — (যুগান্তর দলের মহিলাদের জন্য পত্রিকা), (৭) জয়শ্রী — (লীলা নাগের দায়িত্বে ছিল), (৮) বন্দী জীবন — সম্পাদক ঃ শচীন সান্যাল, (৯) বেণু — ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, (১০) সঞ্জীবণী, (১১) হিতবাদী, (১২) বঙ্গবাসী, (১৩) অমৃতবাজার পত্রিকা (মতিলাল ঘোষ পরিচালিত), (১৪) বসুমতি, (১৫) আনন্দবাজার।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলা সাংবাদিকতায় জোয়ার এসেছিল। এরপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলা সাংবাদিকতার একটি নতুন পর্ব আরম্ভ হয়। যেসব সংবাদপত্রগুলি এ-সময় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেগুলির মধ্যে বঙ্গবাসী, দৈনিক আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক আত্মশক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বহু গুপ্ত পত্র-পত্রিকা ছিল।

তবে আমাদের আলোচনার এই তিনজনের কেউ তখনকার সংবাদপত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাদের একজন বললেন — পোস্ট অফিসে কাগজ আসত এবং ছেলেরা সেখানে গিয়ে পড়ে আসত। আর একজন গুপ্ত পত্রিকা যুগান্তরের কথা বললেন। পুষ্পলতা দেবী কোনও ধারণাই দিতে পারলেন না। তাহলে কি পত্র-পত্রিকাগুলি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (পুষতান্ত্রিকতার কথা মাথায় রেখে)?

দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধ ও মন্বন্তর ঃ

১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করার দুদিন পর, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্স ৩ রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন। এরকম ভাবে হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করায় আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিপ্লবীরা নতুন করে আন্দোলনের ডাক দেয়। একই সঙ্গে আন্দোলনে নামে শ্রমিক শ্রেণী। তারা অতিরিত্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার আক্রমণ করলেন সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। যুদ্ধে নতুন মোড়। ভারতেও তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন রূপ নেয়। এতদিন ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিদ্ধে যে জাতীয় সমাবেশ ছিল তা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ ১) কংগ্রেস পরিচালিত ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন (ভারত ছাড়ো আন্দোলন); ২) জার্মান ও জাপান থেকে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আই.এন.এ. আন্দোলন এবং ৩) কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধ আন্দোলন।

এখন দেখা যাক প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্বিতীয় ঝিযুদ্ধের এ-সময় সম্পর্কে কি বলেন।

সুশীল চত্রবর্তী এবং অমলা ঘোষ তখন কলকাতা শহরে এবং তাদের বর্ণনায় যেটুকু ধরা পড়ে তা খুব সাধারণ ঘটনা। ত

ারা ঘন ঘন সাইরেন শুনতে পান, ব্ল্যাক আউট হলে অন্ধকার ঘরে বসে থাকেন, আর বিপদ এড়াতে উঠোনে তৈরি গর্তে আশ্রয় নেন। কলকাতায় বোধহয় এর বেশী কিছু ঘটেওনি।

পুষ্পলতা চক্রবর্তী তখনও চট্টগ্রামে। তিনি কিন্তু শুধু সাইরেনে ধ্বনিই শোনেননি, দেখেছেন অনেক কিছু। শঙ্কর নদীর এপারে ছিল ওদের বাড়ি। ওপাড়ে চাগাচরের মাঠ। হাজারে হাজারে প্লেনের যাতায়াত দেখা যেত। আর নদীর চরে পড়ে থাকা মৃতদেহ। ওঁর কথায় — "এপার থেকে অনেকটা মাছের মতই লাগত ওঁদের"। পাশাপাশি শুয়ে রাখা হত দেহগুলি। প্রত্যেক বাড়ির উঠানে সুড়ঙ্গ, ওপরে ঢাকনা। বোমা গর্তের ওপর না পড়লে বেঁচে যেত মানুষ। অর্থাৎ সে আশ্রয়ও নিরাপদ ছিল না পুরোপুরি। বৃদ্ধার দাঁত কাঁপছে, তবু খাতায় আঁকলেন সুড়ঙ্গের রেখাচিত্র। একদিন খুব বিপদের মুখে পড়লেন তিনি। প্রতিদিনই বেলা এগাড়োটা-বারোটা নাগাদ শু প্লেনের ওড়াওড়ি। সেদিন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাওয়ার পথে যুদ্ধের মুখোমুখি পড়লেন একদম। মাঠের ওপর বোমা পড়ছে অনবরত। ওঁর সঙ্গে দুই ছেলে আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে কাঁটা বনে গাছের আড়ালে লুকোতে হল। প্রথমে ছোট ছেলে তার ওপর ছেলেকে শোয়ালেন। তার ওপর নিজে কানে অঙুল দিয়ে উপুড় হয়ে রইলেন। অর্থাৎ বিপদ যেন তাকেই আগে স্পর্শ করে। সে যাত্রায় তারা সবাই রক্ষা পান।

বছর ঘুরতে বাংলায় ঘনিয়ে আসে আর এক বিপদ — দুর্ভিক্ষ, যা তেতাল্লিশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ১৯৪২ থেকেই শু হয়ে যায় মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের কাহিনী। এ-বছর ফসলের উৎপাদন ছিল কিছু কম। তার একটি কারণ মেদিনীপুর ও দক্ষিণবঙ্গে বিধবংসী ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়ক। তবে আকালের পেছনে অন্য কারণও ছিল। জার্মান বাহিনীর আক্রমণে রেঙ্গুনের পতন হয় এবং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। গবেষকরা অবশ্য অন্য কারণও দেখান। প্রথমত, সে বছর যে পরিমাণ শস্য আমদানি করা হয়েছিল, রপ্তানি করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ছিল না কিনে খাওয়ার। কারণ, খাদ্যশস্যের, বিশেষ করে চালের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে।

কিছু তথ্য ঃ— ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চালের পাইকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৩ থেকে ১৪ টাকা। ১৯৪৩-এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা, আগস্টে ৩৭টাকা এবং বেসরকারী মতে আরও বেশি। চট্টগ্রামে অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছায় ৮০ টাকা মণ। ঢাকায় ১০৫টাকা।

তবে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুটা কম ছিল, বিশেষ করে কলকাতায় একেবারে ছিলই না বলা চলে। এর প্রমাণ পাই কলকাতা শহরবাসী সুশীল চক্রবর্তী ও অমলা ঘোষের বর্ণনায়। তারা ভিক্ষা পাত্র হাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের দেখেছেন। 'অন্ন চাই প্রাণ চাই' নাটকে ফ্যান চাওয়ার ঘটনা শুধু গল্প নয় সত্যি। এদের দরজায় দাঁড়িয়েও অনেকে ফ্যান চেয়েছে সেদিন। তবে এরা নিজেরা ছিলেন দুর্দশা-মুক্ত। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলেও চাল সংগ্রহে ছিল সবার। কাজেই অসুবিধা হয়নি কোনও। কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় খোলা হয়েছিল লঙ্গরখানা। গ্রাম থেকে বহু মানুষ চলে আসছিল শহরের দিকে এবং একসময় কলকাতা পরিণত হয় মৃতের অঙিনায়। নৃতাত্বিক অনুসন্ধান অনুযায়ী সে বছর মৃত্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৭ লক্ষ। কলকাতার রাজপথ যখন মানুষের মৃতদেহ আকীর্ণ, তখনও কিন্তু কলকাতার লোকেদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। চট্টগ্রাম তথা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়ে। পুষ্পলতা চক্রবর্তীর কথায় ঘরে ঘরে তখন কলেরা হচ্ছে। যে কোনও খাদ্য খাওয়ার আগে গরম জলে ধুয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সকলকে। সে সময় দুধ খেত না কেউ বরং দই পেতে খাওয়া হত। তাতে নাকি ক্ষতি হত কম। তবে হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষ এদেরও প্রভাবিত করেনি সেভাবে। কারণ, এদের গোলা ভরা ধান ছিল, যার হয়ত কোনও অংশই কাজে লাগেনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের।

১৯৪২-৪৩ সালের এই মন্বন্তর স্থান পেয়েছিল বহু লেখকের গদ্য এবং পদ্যে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম — বনফুলের 'ডানা', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর "কালো ঘোড়া", তারাশঙ্করের "মন্বন্তর"। এছাড়া জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতাতেও মন্বন্তরের ছবি ভেসে ওঠে। সুকান্ত নিজেকে বললেন, 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,/ প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি,/ আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,/ আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেণ ডেকে যায়.....'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫-এ। এই মহাযুদ্ধ শেষ হতেই পৃথিবীতে বিপ্লবের এক বিরাট ঢেউ ওঠে। ভারতবর্ষেও এর প্রভাব পড়ে। আবার শু হয় বিপ্লব। শ্রমিকরা এই বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ফের শু হয় মিছিল, মিটিং, হরতাল, গুলি এবং মৃত্যু।

দেশ ভাগ ঃ

যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা চাইছিল যে কোনও ভাবে ভারতের ঐক্যসত্তিতে ছেদ ঘটাতে এবং তার সবচেয়ে সহজ পথ দুই ধর্মের মানুষে বিভেদ ঘটান। সুতরাং শু হল হিন্দু-মুসলমান বিবাদ। যদিও ঘটনা এত সহজ নয়। তবে যাই হোক, পরবর্তী সমস্ত ঘটনার মূলে ছিল হিন্দু বুর্জোয়াদের দল কংগ্রেস এবং মুসলিম বুর্জোয়াদের মুসলিম লিগ। যুদ্ধের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে, কংগ্রেসের (তথা গান্ধীজীর) প্রতিরোধ ব্রিটিশ সরকারকে মুসলিম লিগের (তথা জিন্নার) 'পাকিস্থান' দাবির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ক্ষমতা লোভের এই রাজনীতি শেষ করে দেয় দেশের ঐক্য, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি — দেশভাগ।

দেশভাগ হিন্দু উচচ ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর একটি গভীর দুঃখের জায়গা। ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দু বাঙালীরা যে কারণে আজও ভারতকে দেশ বলতে দ্বিধা বোধ করেন। বলেন আমার দেশ ছিল চট্টগ্রাম কিংবা ফরিদপুর কিংবা বরিশাল — অর্থাৎ আমার জন্মভূমি। এসব এখন তাদের কৌমচেতনারই অন্তর্গত। সুশীল চক্রবর্তী বা অমলা ঘোষ — সবার কণ্ঠেই ধবনিত হয় এক সুর। সে সুর বিষাদের, সে সুরে জন্মভূমি ছেড়ে আসার বেদনা। অথচ বাংলাদেশ যাওয়ার কথা বললে সুশীল চক্রবর্তী বলেন — "না, এখন আর যেতে ইচ্ছে করে না। সে বাংলাদেশ আর নেই।" আক্ষেপ করে ফের বলেন — "সে ভারতও আজ আর নেই।"

পুষ্পলতা দেবী এবং অমলা দেবীর কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে — "আমাদের বাড়ি, উঠোন, ক্ষেত আর নদীর কথা ভীষণ মনে পড়ে। মনে হয় জীবনের শেষে একবার গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু কেউ যে নেই।" ফের বলেন — "কি হবে গিয়ে? সব শেষ হয়ে গেছে — সব। কেউ কোথাও নেই। না, যাওয়া হবে না আর।" বৃদ্ধার চোখে জল চিক্‌চিক্ করে ওঠে, "বয়স বেড়েছে, এখন আর পারব না ভাই।"

কিছু তথ্য ঃ— ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশা নিয়েই বঙ্গপ্রদেশ গঠিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষের অধিক এবং এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসী ছিল বাঙালী। বাঙালীদের শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান, বাকিরা হিন্দু। পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশায় ছিল হিন্দুদের সংখাধিক্য। (লক্ষণীয়, কলকাতায় ছিল মুসলিম সংখ্যাধিক্য।) বঙ্গপ্রদেশের আয়তন খুব বৃহৎ ছিল— এই অজুহাতে বঙ্গদেশ থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছেদ করা হয় লর্ড কার্জনের নির্দেশে এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়ে ঢাকা শহরকে রাজধানী করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠন করা হয়। এই নতুন প্রদেশ বাঙালীর সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ এবং এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২কোটি ৯০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা সহ কলকাতাকে রাজধানী হিসেবে রেখে বঙ্গপ্রদেশ নামে যে প্রদেশ রইল তাতে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রদেশ মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বিংশ শতাব্দীর শুতে বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শু হয়েছিল, তাকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ইন্ধন জোগাবার অভিসন্ধি নিয়ে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল।

সেই রেশ ধরেই ফের ভাগ হল দেশের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান, তারপর পাকিস্থান ও পূর্ববঙ্গ। তারপর পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ।

দেশ ভাগ কি শুধু দুটি দেশের মাঝে এক অদৃশ্য বিভেদ রেখা? না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ব্যর্থতা, রাজনৈতিক দাবা খেলা, দাঙ্গা আর পরিণতিতে মৃত্যু। ব্রিটিশরা যাওয়ার সময়ও যে এভাবে ,স্থায়ী আঘাত করে যাবে তা বুঝতে পারেনি কেউ। প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু দাঙ্গার কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন। অমলা দেবীর কথায় বাঙালী মুসলিমদের অন্যান্যরা দাঙ্গায় অংশগ্রহন করেছিল বেশী। আর তারা নাকি শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর বেশী আক্রমণ চালায়। এসময় দেশের মুসলিম প্রজারা তাদের সাহস জোগাত। বলত — "আমরা থাকতে কোনও ক্ষতি হতে দেব না।" এজন্য আশঙ্কা কম ছিল অনেক। একই কথা বলেন সুশীল চক্রবর্তী। কলকাতায় নাকি অনেক মুসলিম বন্ধু ছিল তাঁর। অথচ যখন তথাকথিত

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চলছে তখন কিন্তু একটিও মুসলিম বন্ধু নেই। যদিও দাঙ্গার সময় অবাধ যাতায়াত করছেন মুসলিমদের এলাকায়। অর্থাৎ ইনি ছিলেন আশঙ্কা মুক্ত।

পুষ্পলতা দেবীর ক্ষেত্রে ঘটনা কিছুটা অন্যরকম। দাঙ্গা চলাকালীন, এক রাতে তার বাড়িতে হামলা করে কয়েকজন সশস্ত্র যুবক। বিস্ময়ের কথা, তখন তিনি দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বাড়িতে একা। কোনও পুষ নেই। তাঁর সাহসই নাকি তাঁকে রক্ষা করেছে প্রতিবার। দাঙ্গা বা বাড়িতে আচমকা আত্রমণের প্রতিরোধ করার জন্য এদের সংগ্রহে ছিল লঙ্কার গুঁড়ো এবং ইট-পাটকেল। সেদিন রাতে প্রায় আশি-নববই জন (তার বর্ণনায়) বাড়িতে হানা দেয় এবং দরজা ধাক্কাতে থাকে। দরজার পেছন থেকেই কথা বিনিময় হয়। কথাও নয়, গালিগালাজ। তবে ছেলেরা চেঁচামেচি শু করায় পাড়ার লোক জড়ো হয় এবং তাঁরা পালাতে বাধ্য হয়। রাতের অন্ধকারে চেনা যায়নি কাউকেই। কিন্তু পরের দিন কোনও মুসলিম প্রজাই কাজে অ াসেনি, এরপর তাঁরা আশ্রয় নেন আত্মীয়ের বাড়ীতে। রাতে সেখানে আর দিনে নিজের বাড়িতে। এভাবে আর কয়েক বছর, তারপর দেশ ছাড়তে হয়েছিল চিরতরে।

সুশীল চত্রবর্তীর কথায়, দেশ ভাগের পেছনে শুধু জিন্না, গান্ধী আর মাউন্টব্যাটেন নয়, সায় ছিল হিন্দু জমিদারদেরও। এসময় প্রচুর লুঠতরাজ হয় এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এতে অংশগ্রহন করে। তাঁর কথায়, দেশভাগের পেছনে ছিল হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর ষড়যন্ত্র আর ছিল মুসলমানদের স্বার্থ।

মুসলিম লিগের ধারণা ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে ন্যায় ও সুবিচারের কোন ঠাঁই নেই। আর সে কারণেই ১৯৪৬ সালে এরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। কলকাতার দাঙ্গায় প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন সুরাবর্দি। এবছর আগষ্ট মাসে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় শহরে। তবে তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এসময় পুলিশ প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু যারা দেশভাগকে প্রশ্রয় দিল তারা কি জানত না হিন্দুরা পাকিস্থান ছেড়ে ভারতে আসবে না, আবার সব মুসলমানরা ভারত ছেড়ে ওদেশে যাবে না? তবে কেন এ দেশ ভাগ? ফের কেন আন্দোলন হল না এর বিদ্ধে? কোনও বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ? দেশবাসী তখন ক্লান্ত আর নেতৃত্বস্থানীয়রাও স্বাধীনতা ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছে না। তাঁদের চোখে ১৫ আগষ্ট ছিল মুক্তির দিন। এর বেশী কিছু ভাবতেই পারেননি তাঁরা।

স্বাধীনতা ঃ—

অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে, ঠিক ১২টায় ভারতবর্ষ' — দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়। ঘরে ঘরে শঙ্খ ধবনি ওঠে, একইসঙ্গে সবাই গেয়ে ওঠে "বন্দে মাতরম"।

সবশেষে আমরা ফিরে যাই এই দিনটিতে। এত বছর পর কি মনে হচ্ছে তাঁদের? সবাইকে একই প্র্ন করলাম। আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছি?

সুশীল চত্রবর্তী আক্ষেপ করলেন। বললেন— "কোথায় আর স্বাধীন হলাম? ব্রিটিশদের বিদ্ধে লড়াই করেছিলাম কারণ ত ারা ছিল অত্যাচারী শাসক। তারা মানুষের রোজগারের পথ বন্ধকরে দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি দেশের অবস্থা খার াপ। এখনকার শাসকগোষ্ঠীও তো দেখি তাদের চেয়ে কিছু কম নয়। দিন দিন বেকার সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যা বাড়ছে দরিদ্র শ্রেণীরও। এ কেমন স্বাধীনতা?

আমরা ফের প্র্ন করি, স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে গর্ববোধ করেন কি? বললেন— "গর্ববোধ? গর্ববোধ করার কি আছে? স্ বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ছিল আমাদের কর্তব্য। কিন্তু উদ্দেশ্যই তো সফল হয়নি। এখন পুরোনো কথা মনে পড়লে কষ্ট হয়....."

অমলা ঘোষ বললেন — "হ্যাঁ, আমরা স্বাধীন হয়েছি। ব্রিটিশদের হাত থেকে তো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাকি, বর্তম ান সমাজ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তবে হ্যাঁ, আগে বোধহয় এখনকার চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ছিল....."

পুষ্পলতা চত্রবর্তী ফের দেশভাগের কথা বলে আক্ষেপ করলেন। বললেন — "বাড়ি ঘর কিছু আর উদ্ধার হল না। দেশ ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীন হল ঠিকই, কিন্তু....."

এত ঘটনা, এত আলোচনা, বিশ্লেষণ পর সত্যই প্র্ন জাগে আমরা কি স্বধীন? গত শতকের গোড়ার দিককার হিন্দু মধ্যস্বত্বভো াগীদের সন্তান বর্তমান হিন্দু মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভই কী ছিল — অন্তত পশ্চিমবাংলার কথা ভাবলে, স্ব াধীনতা সংগ্রামের (?) উদ্দেশ্য? শহুরে এই মধ্যবিত্তের হাতে আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান, জ্ঞানের এই নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হ

াতে রেখে আর কতদিন তারা নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সমগ্র বাঙালি জাতির বলে প্রচারের সুযোগ পাবে? ইতিহাস স্রোতস্বিনী। থামাতে চাইলেও সে থামবে না। সময়ই শুধুমাত্র শেষ কথা বলবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com